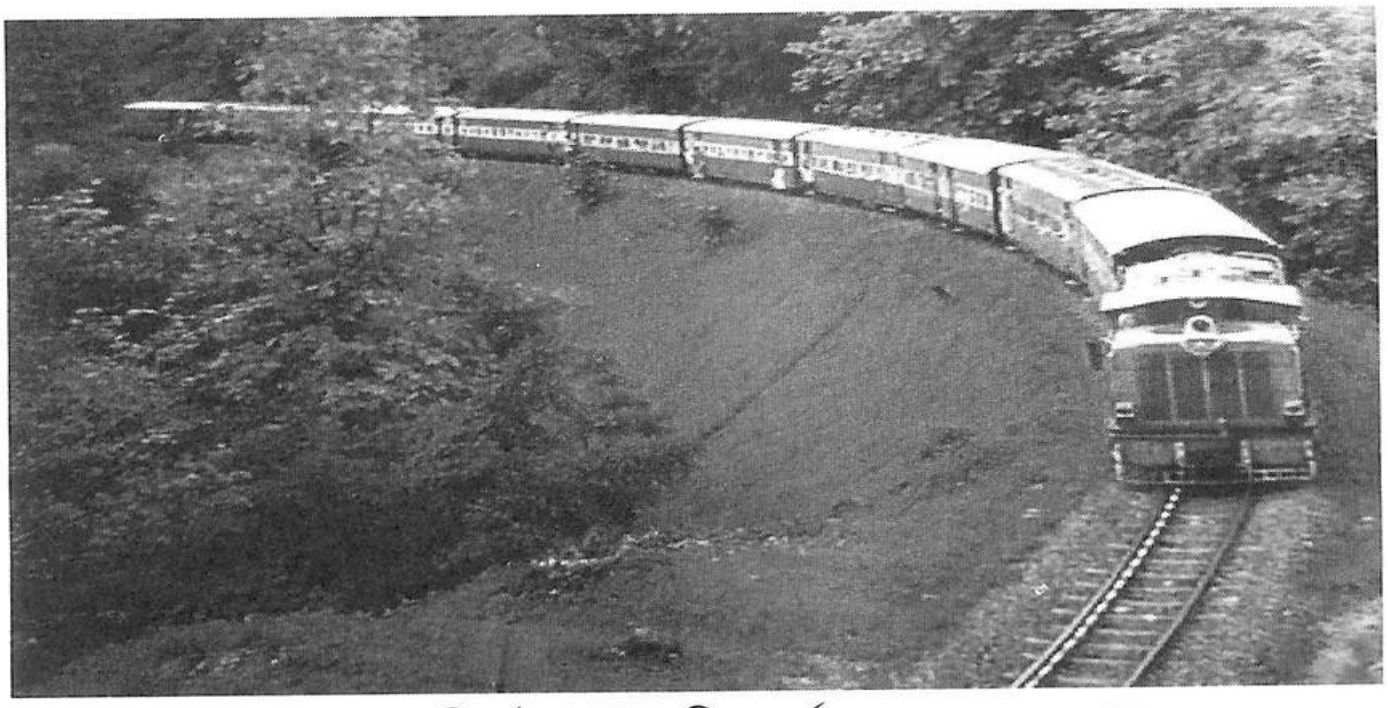

ছবি সৌজন্যে দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ে

বনের খবর : দেশ-বিদেশ

প্রসাদরঞ্জন রায়

(প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র সচিব ও প্রাবন্ধিক)

বন ও বন্যপ্রাণ বরাবরই আমার খুব প্রিয়, যদিও আমরা শহর কলকাতার বাসিন্দা। ছেলেবেলায় ভ্রমণসূত্রে ও আমার বনে যাবার সুযোগ হয় নি, অবশ্য তখন তার রেওয়াজ ছিল না। স্পষ্টতই আমার উৎসাহটা ছিল বই-কেন্দ্রিক আর বাৎসরিক চিড়িয়াখানা ও বোটানিক্স ভ্রমণ সঞ্জাত। গত চল্লিশ বছরের পরিস্থিতিটা পালটে গেছে— প্রথমত চাকরির প্রশিক্ষণকালে মসুরি থেকে গাড়ওয়ালের বিভিন্ন অঞ্চলে ট্রেকিং সূত্রে, দ্বিতীয়ত চাকরির প্রথম আট বছরের অধিকাংশ সময়টাই উত্তরবঙ্গের তরাই, ডুয়ার্স ও পার্বত্য অঞ্চলে কাটিয়ে। তখনই বন আমার মনে একটা পাকাপাকি জায়গা করে নিয়েছে। গত দশ বছরে দেশের বিভিন্ন বিখ্যাত অরণ্য ঘুরে দেখার সুযোগ হয়েছে, দেশের বাইরেও পা দিয়েছি বনাঞ্চলে বেশ কয়েকবার। এর ভিত্তিতেই বনাঞ্চলের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে গুটিকয়েক কথা বলার আছে, অবশ্যই তা একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত।

এখন দেখছি, যে বনাঞ্চল চল্লিশ বছর আগে আমাকে প্রায় মোহগ্রস্ত করেছিল, তার আকর্ষণ যেন ক্রমশ কমে যাচ্ছে। প্রথমেই বলি বন্যপ্রাণী (বিশেষ করে বাঘ) দেখাটা আমার কাছে অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, যতটা বনাঞ্চলের স্বাস্থ্য, নৈসর্গিক সৌন্দর্য আর নীরবতা। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি আমার স্বপ্নের বনভূমি— বিশেষ

করে এখনকার বক্সা টাইগার রিজার্ভের অন্তর্গত নিমাতি, পানবাড়ি, বালাপাড়া, জয়ন্তি বা তার বাইরে চিলাপাথা, এমন কী জলদাপাড়ার সীমান্তবর্তী জঙ্গল প্রায় ন্যাড়া হয়ে গেছে। চোরাশিকার যে এ অঞ্চল থেকে একেবারে বিদায় নিয়েছে তা নয়, কিন্তু তার থেকে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বনাঞ্চলের মধ্যে বা তার সীমানায় গ্রাম, জ্বালানির জন কাঠ সংগ্রহ আর পশুচারণ। বক্সা বনভূমিকে আমার এক সহকর্মী ও প্রাক্তন বনকর্তা বলেছিলেন 'দেশের বৃহত্তম গরু চরানোর মাঠ'। এখনো দৈনন্দিন এক লক্ষ গরু চরে বক্সা বনভূমিতে— এটি 'প্রোজেক্ট টাইগার'-এর স্বীকৃত তথ্য। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তৃণভোজী প্রাণীদের খাদ্যে টান ধরছে, বন ছেড়ে বেরিয়ে আসছে গৌর বা গণ্ডার— মানুষের সঙ্গে সংঘাতেরও সম্ভাবনা বাড়ছে। হাতির সমস্যাটা অন্য ধরনের। বহু প্রজন্ম ধরে হাতিরা চলাফেরা করে আসাম-ভুটান-উত্তরবঙ্গ-নেপাল জুড়ে একটি বিস্তীর্ণ 'করিডর'-এ। এখন তার মধ্যে থাবা বসিয়েছে উন্নয়নের ফসল— গ্রাম ও আধাশহরের বিস্তার, চা-বাগানের লেবার লাইন, রাস্তাঘাট ও সর্বোপরি রেললাইন। তার উপরে জঙ্গলের অভ্যন্তরে খাদ্যসংকট। বেচারিরা যায় কোথায়?

উত্তর বাংলার দুটো বিশেষ সমস্যার কথা আরেকটু বলা দরকার— রেলপথ আর ভ্রমণার্থীদের চাপ। উত্তরবঙ্গ দিয়ে শিলিগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ার (ও তারপরে আসাম) মিটার গেজ রেলপথ তৈরি হয় ১৯১০-১১ সালে। শিলিগুড়ি থেকে সবক, বাগড়াকোট, ডাম ডিম, চালসা, মাল, বিন্নাগুড়ি, মাদারিহাট, হাসিমারা, রাজাভাতখাওয়া হয়ে এই ১৬১ কিলোমিটারের রেলপথে বার চারেক যাবার অভিজ্ঞতা হয়েছিল আর বনের মধ্য দিয়ে সে অপূর্ব ভ্রমণের স্মৃতি আজও ভুলি নি। এ টি মেল আর গৌহাটি-লক্ষ্মৌ এক্সপ্রেস তখন চলত এ পথে। ১৯৬০-এর দশক থেকে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে নিউ বনগাইগাঁও হয়ে ব্রজ গেজ ট্রেন চালু হয়, তবে সে পথটি দক্ষিণে বনাঞ্চল ছাড়িয়ে খাসমহল এলাকা ধরে। অনেক আলোচনার পর আসামে মাল ও যাত্রী পরিবহনের সুবিধার জন্য উত্তরের মিটার গেজ লাইনটি ব্রড গেজে পরিণত করা হয় ১৯৯২-১৯৯৪ সালের মধ্যে, অথচ দক্ষিণের মূল ব্রডগেজ লাইনটিকে বাড়াবার চেষ্টা করা হল না। সঙ্গে সঙ্গে দুর্ঘটনায় হাতি মৃত্যুর হার যেন লাফিয়ে বেড়ে গেল। আগেও যে দুর্ঘটনা হত না তা নয়, মিটার গেজ আমলে গড়ে একটি দুর্ঘটনা ও একটি হাতি মৃত্যু ঘটত বছরে— এখন ব্রডগেজ হবার পর ১০ বছরে ৩০টি দুর্ঘটনা ও ৫৫টি হাতির মৃত্যু ঘটেছে! এর মধ্যে আছে সেই কুখ্যাত ২০১৩ সালের ১৩ই নভেম্বর যেদিন ১৭টি হাতির মৃত্যু হয়। সে দিনটি কখনো ভুলব না, কারণ সারা দিনটা চাপড়ামারি বন বাংলাতে আনন্দের সঙ্গে কাটিয়ে সন্ধ্যায় ঝাণ্ডিদাড়া পৌঁছে খবরটি পেলাম। একথাও ঠিক যে ব্রজগেজ কনর্ভাসন-এর আগে রেলওয়ে বোর্ড বনমন্ত্রকের 'প্রোজেক্ট এলিফ্যান্ট'-এর সঙ্গে একটি যৌথ কমিটি

করেছিলেন এবং সে কমিটি কেবল বনের মধ্যে চারটি 'এলিফ্যান্ট করিডর'-এর ৩০ কিমি মতন রেললাইন চিহ্নিত করে সেখানে রাত্রে আস্তে ট্রেন চালাতে বলেছিল। রেলওয়ে বোর্ডের মতে তা অনুসৃত হচ্ছিল, কিন্তু এখন এসব দুর্ঘটনার পর এনকোয়ারি কমিটি দেখেছেন যে বনের মধ্যে বা বাইরে প্রায় সর্বত্রই হাতিদের চলাফেরার প্রমাণ স্পষ্ট। মনে হয় গোটা অঞ্চলটিকে 'এলিফ্যান্ট করিডর' চিহ্নিত করে গতিনিয়ন্ত্রণ করা এবং রাতে ট্রেন চলাচল (বিশেষ করে মালগাড়ি) বন্ধ করা খুবই প্রয়োজন (অধিকাংশ দুর্ঘটনাই ঘটেছে সন্ধ্যা ৬টা থেকে সকাল ৬টার মধ্যে)— তবে তা করা যাবে কী?

দ্বিতীয় অর্থাৎ ট্যুরিজম সংক্রান্ত চাপ প্রধানত দেখা যায় গরুমারা-চাপড়ামারি-খুট্টিমারি এলাকায়। এ অঞ্চলে থাকার ব্যবস্থা ছিল ছোট ছোট দুই কামরার বন বাংলোয় যাতে বিদ্যুৎ ছিলনা, খাবার ব্যবস্থা ছিল অতি সাধারণ— তবে বনপ্রেমীরা নিশ্চিন্তে ও নিঃশব্দে বন উপভোগ করতে পারতেন। আর এখন? মূর্তিতে ফরেস্ট কর্পোরেশনের বড় বাংলো আর চালসাতে একটি রিসর্ট ছাড়াও গরুমারার গোটা রাস্তা জুড়ে গায়ে গায়ে তথাকথিত রিসর্ট! অনেকগুলো জিপসি একসঙ্গে বন দাপিয়ে ঘুরে বেড়ালে বনের সৌন্দর্য বা নৈঃস্তব্ধ্য উপভোগ করা যায় কী? ওয়াচ-টাওয়ার থেকে কিছু দেখার সম্ভাবনাও খুব একটা থাকে না। এ প্রসঙ্গে এটুকু বলার দরকার যে বাঘ না দেখলেই জঙ্গলে যাওয়া বৃথা যাঁরা মনে করেন, আমি অন্তত সে দলের সভ্য নই! গাছপালা, বিভিন্ন সময়ে ঝিঁঝির ডাক, পাখির শিস, বৃষ্টির পরে ভেজা মাটির গন্ধ— এসবই আমার খুব প্রিয়। তবে জঙ্গলে যাঁরা প্রথম যাচ্ছেন, কিছুই দেখা না গেলে তাদের উৎসাহ ধরে রাখা কঠিন। বনে 'সাফারি'তে যাবার সময় ভালো গাইড থাকাও একান্ত জরুরি। আমার মনে হয় ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এ ব্যাপারে আমাদের একটু খামতি আছে।

দক্ষিণবঙ্গের অবস্থাও এর থেকে খুব আলাদা নয়। পুরুলিয়া-ঝাড়গ্রাম-বাঁকুড়া ব্যাপী দক্ষিণ বঙ্গের জঙ্গলমহলের স্বাস্থ্য বেশ ভঙ্গুর। ব্যাপক গাছ কাটার সমস্যা তো আছেই, বিশেষ করে পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়ার রাণীবাঁধ অঞ্চলে মাওবাদী সমস্যার জেরে প্রায় দুই দশক দর্শকের পা পড়েনি। এখন অবশ্য এ সমস্যা অনেকটা নিয়ন্ত্রণে। তবে দীর্ঘদিন স্থানীয় উপজাতীদের শিকারখেলা উৎসবের পর ছোট বন্য প্রাণী ও বেশী নজরে পড়ে না। হাতি অবশ্যই আসে প্রধানত দলমা পাহাড় থেকে ধান পাকার মরশুমে। হাতি ফসল নষ্ট করে বলে হাতি দেখলেই গ্রামের মানুষ টিনের ক্যানেস্তারা, আগুন ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। হাতির দল ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবার সময় অনেক সময় বাচ্চা হাতি পুকুরে বা কুয়োয় পড়ে আহত হয়, মারাও যেতে পারে। দল থেকে ছত্রভঙ্গ হয়ে আসা হাতিরা থাকে চড়া মেজাজে এবং মানুষকে আক্রমণ করাও খুব বিরল ঘটনা নয়। সুতরাং, পর্যটকরা সাবধান! অন্যদিকে সুন্দরবনের অবস্থা কিছুটা অন্যরকম। সেখানে বাদাবনের মাঝে অনুপ্রবেশ ঘটেছে আবাদী জমির আর বাঘ কুমীরের

বিচরণক্ষেত্রে নিয়মিত হাজার হাজার মানুষ ঢোকে মাছ বা কাঁকড়া ধরতে আর কাঠ বা মধু সংগ্রহ করতে। দুর্ঘটনাও ঘটে প্রায় নিয়মিত। অন্য দিকে পর্যটকদের সমস্যা অন্যরকম। সুন্দরবনে পরিচ্ছন্ন বাসযোগ্য যাত্রীবিনাস বিরল, তাই পর্যটকরা রাত কাটান প্রায়শই বোটে বা লঞ্চে। তার থেকে ছড়িয়ে পড়ে নানা ধরনের দূষণ। ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে দেখেছি অগুন্তি লঞ্চের ভিড়, ফলে ওয়াচ-টাওয়ারে যাওয়া-আসা করাও দুষ্কর, আর পর্যটকদের কথাবার্তার আওয়াজে প্রাকৃতিক শব্দ শোনাই মুশকিল। এ ছাড়াও আছে লাউড স্পিকারে জোরালো মিউজিক! তবে শুনছি গাইডদের মাধ্যমে এসব নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলছে।

তা হলে আমরা দাঁড়িয়ে আছি কোথায়? ভারতের অন্যত্রও পরিস্থিতি খুব একটা স্বতন্ত্র নয়। ভারতে জনসংখ্যার চাপ এত বেশী যে সংরক্ষিত এলাকার সংখ্যাও কম আর তাদের আয়তনও বেশ কম। ভারতের প্রথম ন্যাশনাল পার্ক ঘোষিত হয় ১৯৩৫ সালে— হেইলি (আজকের করবেট) ন্যাশনাল পার্ক। কিন্তু ১৯৭০ সালেও এদেশে ছিল মাত্র ৪টি ন্যাশনাল পার্ক আর ৬১ টি অভয়ারণ্য। ১৯৭০'এর দশকে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন আর প্রোজেক্ট টাইগার আনার পর অনেক সংরক্ষিত এলাকা যুক্ত হয় কিন্তু ১৯৯০-এর দশক থেকে বৃদ্ধির হার কমে এসেছে। বর্তমানে ন্যাশনাল পার্কের সংখ্যা ১০৫, মোট আয়তন ৪০,৫০০ বর্গ কিলোমিটার (মোট এলাকার শতকরা ১.২৩ ভাগ) অবশ্য অভয়ারণ্য ধরলে সংরক্ষিত এলাকার সংখ্যা প্রায় ৬৫০ এবং তা মোট এলাকার শতকরা ৪.৭ ভাগ। তবে সকলেরই জানা যে ন্যাশনাল পার্কের তুলনায় অভয়ারণ্যে সম্পদ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা অনেকটাই কম। যা আরো গুরুত্বপূর্ণ তা হল একটি সংরক্ষিত এলাকার আয়তন, কারণ বড় জন্তুর খাদ্যসংগ্রহ ও বসবাসের জন্য জায়গা লাগে বেশী। আমাদের ১০৫টি ন্যাশনাল পার্কের মধ্যে মাত্র দশটির আয়তন ১০০০ বর্গ কিলোমিটারের বেশী— এর মধ্যে বৃহত্তমগুলি প্রায় সবই মরু অঞ্চল বা পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ন্যাশনাল পার্কগুলির মধ্যে কেবল অরুণাচলের নামদাফা, ছত্তিশগড়ের ইন্দ্রাবতী ও গুরু ঘাসিদাস, উত্তর প্রদেশের করবেট, অন্ধ্র প্রদেশের পাপিকোন্ডা আর আমাদের সুন্দরবন এই তালিকায় আসে। অন্য দিকে আমাদের ২৭টি ন্যাশনাল পার্কের আয়তন ৫০ বর্গ কিলোমিটারের কম, তার মধ্যে আবার ৮টির আয়তন মাত্র ২ বর্গ কিলোমিটার বা আরো কম। বেশ কটি ন্যাশনাল পার্ক আবার নানাভাবে বিপন্ন— উগ্রপন্থী আন্দোলন, পোচিং-এর চাপ, চারণের সমস্যা, ভূমিক্ষয়, খনি ও শিল্পের আগ্রাসন, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রয়োজন, রাস্তাঘাট ও রেলপথের সম্প্রসারণ, সব মিলিযে ১৫/২০ টি ন্যাশনাল পার্ক দস্তরমতন বিপন্ন। তবে এসব সত্ত্বেও বেশ কটি আনন্দঘন দিন কাটিয়েছি পেঞ্চ, কানহা, বান্ধবগড়, দুধওয়া, কাজিরাঙ্গায়, দেখেছি বিধ্বস্ত মানস কিভাবে ফিরে আসছে স্বমহিমায়, আশা রাখি অন্তত করবেট-রণথম্ভোর-তাডোবা-সাতপুরা-পেরিয়ার'-এ পা রাখতে পারবো শীগ্‌গিরি।

এবার বিদেশে বন প্রসঙ্গে দু-চারটে কথা। দেশের বাইরে একটু বিশদভাবে দেখতে পেরেছি যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার বনাঞ্চল। অবশ্য ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড ও জার্মানিতে কিছু ন্যাশনাল পার্ক দেখেছি, তবে তা এসবের সঙ্গে তুলনীয় নয়। আর দেখেছি সাবা (বা উত্তর বোর্নিওতে) কিভাবে অরণ্যনিধন, কাঠ সংগ্রহ, অয়েল পাম-এর আগ্রাসন ও বন্যপ্রাণীর দেহাংশ চোরাচালানের বিরুদ্ধে লড়াই করছে মুষ্টিমেয় কয়েকজন কর্মী। ইচ্ছা আছে পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকার বনাঞ্চল দেখে আসার। তবে এখানে মূলত যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার কথাই বলব।

যুক্তরাষ্ট্র সম্পন্ন দেশ, জনসংখ্যার চাপও কম। ওখানে ৫৯টি ন্যাশনাল পার্কের মোট আয়তন ২,১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার, গড়ে প্রতিটি ৩,৫০০ বর্গ কিলোমিটার (ভারতের তুলনায় ৯ গুণ)। ১৮৭২ সালে ইয়েলোস্টোন দিয়ে শুরু, ক্রমেই সংখ্যাটি বেড়েছে আর বৃহত্তম আলাস্কার র‍্যাংগেলসেন্ট এলিয়াস ন্যানাল পার্ক (৩২,০০০ বর্গ কিলোমিটার)। যা লক্ষ্যণীয় তা হল ১৯১৬ সালে ফরেস্ট সার্ভিস থেকে স্বতন্ত্র একটি ন্যাশনাল পার্ক সার্ভিস প্রতিষ্ঠিত হয়— আজ তাদের ২২,০০০ প্রশিক্ষিত কর্মীদল ন্যাশনাল পার্কগুলির দেখাশুনো করে। আমাদের দেশে গত দু-দশক ধরে আলোচনা করেও এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়নি। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক বা সাধারণভাবে উপভোগ্য স্থানগুলিকে ন্যাশনাল মনুমেন্ট, ন্যাশনাল রিক্রিয়েশন এরিয়া, ন্যাশনাল গ্রাসল্যান্ড, ন্যাশনাল ফরেস্ট বা ন্যাশনাল লেকসোর বলে চিহ্নিত করে তাদেরও ন্যাশনাল পার্ক সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। এরকম ব্যবস্থা অন্যত্র নেই। তৃতীয়ত, ৫৯টি ন্যাশনাল পার্কের বাইরে আছে ৬৬২৪টি স্টেট পার্ক। সেগুলি সাধারণত আয়তনে একটু ছোট হলেও খুব জনপ্রিয়। গড়ে বছরে ন্যাশনাল পার্কে ২৮ কোটি পর্যটক যায়, আর স্টেট পার্কে তার প্রায় তিনগুণ। প্রধানত এঁদের প্রবেশমূল্যই চলে পার্কগুলি।

মার্কিন মুলুকে গোটা দশেক ন্যাশনাল পার্কে পা রাখলে ও আমার মন কেড়ে নিয়েছে আমার দেখা প্রথম এবং বিশ্বের প্রথম ন্যাশনাল পার্ক ইয়েলোস্টোন। সারা রাত ড্রাইভ করে পৌঁছে গোটা দিনটা ছিলাম সেখানে, অবশ্য রাত কাটাই ওয়েস্ট ইয়েলোস্টোন গ্রামে। এখানে থাকার ব্যবস্থা প্রায় সবই পার্কের বাইরে, কেবল একটি হেরিটেজ হোটেল (যথেষ্ট খরচসাধ্য) আর গোটা কয়েক ক্যাম্পিং গ্রাইন্ড ছাড়া সেখানে জল আর বিদ্যুতের ব্যবস্থা আছে, তাঁবু খাটিয়ে বা ক্যারাভানে থাকা যায়, আর আছে ময়লা ফেলার বিরাট ধাতব 'বিয়ার-প্রুফ লিটার-বিন'। পরে জেনেছি এটাই সাধারণ প্রথা, কারণ খাবারের টুকরো টাকরা সংগ্রহে ভালুক আসত প্রায়ই এবং তার থেকেই অধিকাংশ দুর্ঘটনা ঘটত। ইয়েলোস্টোন লেককে মাঝখানে রেখে চারদিক দিয়ে ঘোরানো রাস্তা— গাড়িতে চলতে চলতে দেখা যাবে বন্য প্রাণী আর অন্যান্য দ্রষ্টব্য। গাড়ি থেকে নামা বারণ এবং পার্ক রেঞ্জাররা এ ব্যাপারে যথেষ্ট কড়া। চলতে চলতেই

দেখলাম বিশালাকৃতি বাইসনের কয়েকটি বড় দল, এল্ক, মুজ, প্রংহর্ণ অ্যান্টিলোপ আর কোয়োটে! দেখতে পাইনি ভালুক (গ্রিজলি বা ব্লাক বেয়ার) এবং নেকড়ে— তবে যা দেখেছি তাই অমূল্য। বন্য প্রাণী সম্পদ ছাড়াও এখানে দ্রষ্টব্য নানা ভূতাত্ত্বিক সম্পদ— 'ওল্ড ফেথফুল' উষ্ণ প্রস্রবণ এবং আরো কিছু। প্রাকৃতিক দৃশ্যও চমৎকার। সব মিলে যে অভিজ্ঞতা অবিস্মরণীয়!

এ বছর (২০১৫) ঘোরার অভিজ্ঞতা হয় কানাডার বনাঞ্চলে। এ দেশটি আরো বড়, লোকসংখ্যার চাপ আরো কম, তাই সংরক্ষিত এলাকাগুলিও আরো বড়। এখানে ৩৮টি ন্যাশনাল পার্ক (আয়তন গড়ে ৮,৫০০ বর্গ কিলোমিটার, ভারতের তুলনায় ২১ গুণ)। বৃহত্তমটি অ্যালবার্টার উড বাফেলো ন্যাশনাল পার্ক (৪৪,৮০০ বর্গ কিলোমিটার), আরো ছয়টি অন্তত ২০,০০০বর্গ কিমি। পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় জ্যাস্পার আর ব্যান্ফ। আমরা সেখানে যাই নি, তবে কাছ থেকে দেখেছি নর্থ ওয়েস্ট টেরিটরি'র নাহান্নি, ইউকন অঞ্চলে'র ক্লুয়ানে আর ভ্যাঙ্কুভার দ্বীপের প্যাসিফিক রিম। তবে এখানেও সংরক্ষিত অরণ্যের কেন্দ্রে আছে প্রাদেশিক বা প্রভিন্সিয়াল পার্ক। এদের সংখ্যা ২০০০'এর বেশী, গড়ে আয়তন ১৮০০ বর্গ কিমি। আমরা চলতে চলতে দেখেছি অন্তত ৩০ টি আর চলতে চলতেই পথের পাশে দেখেছি উড বাইসন মুজ, ক্যারিবু, এল্ক আর ব্ল্যাক বেয়ার। তবে দুটি স্টেট পার্কে গেছি জলপথে আর সহজেই দেখেছি গ্রিজলি আর আমেরিকার জাতীয় পাখি বল্ড ঈগল। সে অভিজ্ঞতাও ভুলবার নয়।

তবে বিদেশে সবটাই যে ভালো, তা বলা যায় না। মার্কিন মুলুকে পার্ক রেঞ্জারদের তত্ত্বাবধান প্রায় সর্বত্র দেখেছি, কিন্তু কানাডায় তাদের অস্তিত্ব নজরেই পড়েনি। ন্যাশনাল ও প্রভিন্সিয়াল পার্কগুলিতে পর্যটক যারা যান, তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য recrcation আর outdoor life— ক্যাম্পিং, রোটিং, সাইক্লিং, সাঁতার কাটা (প্রায় বরফগলা জলে) ও হাইকিং খুবই জনপ্রিয়। এ সবে বিপদের সম্ভাবনা আছে, প্রায় প্রতি বছরই বেশ কয়েকটি ঘটনায় গ্রিজলি বা ব্ল্যাক বেয়ারদের সঙ্গে হঠাৎ মোলাকাতে পর্যটকরা আহত হন, মৃত্যুও ঘটে মাঝেমাঝেই। এর থেকে বেশী বিপজ্জনক মনে হয় ক্যাম্পারদের কাঠকুটো কুড়িয়ে যত্রতত্র রান্না করা প্রবণতা। রান্নার পর তারা জায়গাটা পরিষ্কার করে দেন ঠিকই, তবে সম্ভাবনা থেকেই যায় আগুন লেগে যাবার। ওদেশে বনাঞ্চলের প্রধান শত্রু আমাদের মতন চোরাশিকার বা গোচারণের চাপ নয়, forest fire বা দাবানল। এগুলো প্রধানত সরলবর্গীয় গাছ— পাইন বা ফার বা স্প্রুপ। একবার আগুন ধরলে সে দাবানল হু হু করে মাইলের পর মাইল সমস্ত বনভূমি গ্রাস করে নেয়। অগ্নি বিধ্বস্ত বনভূমি আমরা আমেরিকাতেও দেখেছি, আরো বেশী দেখেছি এবার কানাডায়। শুনলাম Global Warming বা উষ্ণায়ণের প্রভাবে গত কয়েক বছর ধরেই খরা চলছে উত্তর-পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায়, ফলে দাবানলে ক্ষতির পরিমাণ

বেড়েই চলেছে। এর উপরে গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতন দেখা দিয়েছে মাউন্টেস পাইন বীটলের সংক্রমণ। মাত্র ৫ মিলিমিটার লম্বা এই পোকাটি নানাধরনের পাইনগাছকে (লজরোল, পণ্ডেরোমা, স্কচ পাইন ইত্যাদি) আক্রমণ করে এক ধরনের ফাংগাস সংক্রমণ ঘটিয়ে গাছটাকে মেরে ফেলে ২/৩ বছরে আর বংশবৃদ্ধি করে ছড়িয়ে পড়ে অন্য গাছে। যেহেতু এই অঞ্চলে কাঠের ব্যবসার প্রয়োজনে 'মোনোকালচার'-এর প্রাধান্য, একটা গোটা অঞ্চলের সব পাইনগাছ ধ্বংস হতে বেশী সময় লাগে না। ১৯৯৬ থেকে ২০ বছরে ব্রিটিশ কলম্বিয়ার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ গাছ নষ্ট হয়ে গেছে। এটি বিশ্বের বৃহত্তম পোকা— বাহিত অরণ্যসম্পদ ক্ষতির নিদর্শন। এই পোকার সংক্রমণে মৃত পাইন গাছের মূল্যও কমে যায় ভীষণভাবে আর তাতে আগুন লাগার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। আরেকটা সমস্যা মনে হয়েছে এদের বনভূমির multiple use নীতি— সংরক্ষিত বনে খনিজ নিষ্কাশন বা তেল ও গ্যাসের পাইপলাইন বসানো সব সময় গুরুত্ব পায়, পিছু হঠছে বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ প্রচেষ্টা। তার উপর ব্যাপক হারে লগিং হয় প্রায় সমস্ত ন্যাশনাল ও প্রভিন্সিয়াল পার্কে— মার্কিন মুলুকে এরকম দেখি নি। বনের মধ্যে কাঠবোঝাই লগিং ট্রাকের আনাগোনা পর্যটকদের পক্ষে বেশ বিপজ্জনক তা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই জেনেছি। সশব্দে এই সব ট্রাকের আনাগোনা বন্য জন্তুদের পছন্দ হবার কথা নয়। শুনলাম, লগিং-এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনেক কমে গেছে, তবে যা দেখলাম তাতেই চিন্তার ভাঁজ পড়ল কপালে। এ ছাড়াও আছে বিশেষ মরশুমে শিকারের লাইসেন্স প্রদান। বহু ক্ষেত্রেই সংরক্ষিত বনের পাশেই শিকার চলে অবাধে। এমন কী, ধনী শিকারীরা ছোট প্লেন বা হেলিকপ্টার থেকে অক্লেশে চালান হত্যালীলা— এরকম অবশ্য চোখে দেখিনি, দেখেছি কেবল টেলিভিশনের পর্দায়। পৃথিবী বিখ্যাত ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কেও দেখেছি চারধারে বড় বড় খামার বা র‍্যাঞ্চের প্রাধান্য— পার্কের সীমার বাইরে বাইসন, গ্রিজলি বা নেকড়ে চলে এলেই তা মারবার পূর্ণ অধিকার আছে র‍্যাঞ্চারদের। চেষ্টা করেও তা বন্ধ করা যায়নি— রাজনীতিতে র‍্যাঞ্চার ও বন্দুকবাজদের 'লবি'র প্রভাব এতই বেশী!

সব মিলিয়ে এদেশ ভালো না ওদেশ তা বলা মুশকিল। ১০০ বছর আগে আমার ঠাকুর্দা 'বনের খবর' বইতে উত্তর-পূর্ব ভারতের বনাঞ্চলের যে ছবি এঁকেছিলেন, তা আজ হারিয়ে গেছে। চল্লিশ বছর আগেও আমি উত্তরবঙ্গের বনের যে চেহারা দেখেছি, তাও আজ আর নেই। আমি কেবল চাই যে চল্লিশ বছর পরেও যেন বনপ্রেমী মানুষরা এসবের স্বাদ পান— ঝিঁঝিঁপোকার ডাক, প্রজাপতির পাখনায় বর্ণালীর ছটা, পাখির মনমাতানো শিস, বার্কিং ডিয়ার বা সম্বরের 'অ্যালার্ম কল', ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে কখনো দু-চারটে জন্তুর দেখা পাওয়া, বন্দুক নয় ক্যামেরার ব্যবহার। জানি না, তা আদৌ সম্ভব কিনা, তবে মানুষতো আশাতেই বাঁচে!

(লেখকের জন্ম কোলকাতার বিখ্যাত 'রায়' পরিবারে)